মৃত্যু বলে কিছু নেই, আছে রূপান্তর
অনন্ত অসীম স্রষ্টা, অ-জড় অ-মর

॥ সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ ॥

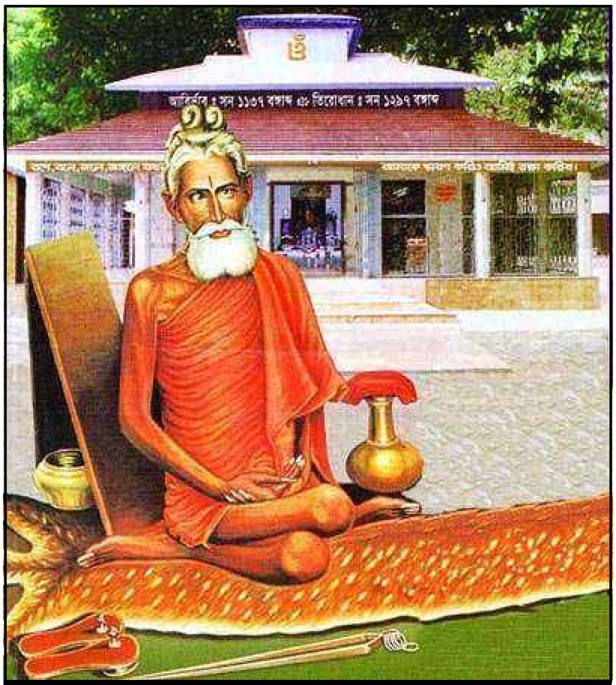

লোকনাথ ব্রহ্মচারী

কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল গাঁয়ের সকলে। রামকানাই ঘোষালের এ বড় অদ্ভুত ইচ্ছা। এ ইচ্ছা একদিকে যেমন ভীষণ এবং নিষ্ঠুর, অন্যদিকে তেমনি পবিত্র এবং ধর্মভাবে পূর্ণ। রামকানাই-এর ইচ্ছা, তার তিনটি ছেলের মধ্যে যে কোন একটি সন্ন্যাস গ্রহণ করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করুক। কিন্তু যখনই সংসারে এই ইচ্ছার কথাটি ব্যক্ত করেন রামকানাই, তখনই ঘোর আপত্তি জানান স্ত্রী কমলাদেবী।

লোকে সাধারণতঃ পুত্র চায় পুত্রসুখ উপভোগ করবার জন্য, বিশেষ করে শেষ জীবনে পুত্রের রোজগারে বেশ কিছু আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়ার জন্য। পুত্র বড় হয়ে অর্থ যশ মান প্রতিপত্তি লাভ করে সব দিক থেকে বড় হয়ে উঠবে সমাজে ও সংসারে, সব পিতারই এই এক কামনা। কোন পিতাই কখনো চান না, তার পুত্র সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হোক। অন্য কোন পিতা না চাইলেও রামকানাই ঘোষাল সত্যি সত্যিই তাই চান। আর এই অদ্ভুত চাওয়ার কথাটা রটে গেল সারা গাঁয়ে।

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বারাসতের কাছাকাছি কচুয়া একটি ব্রাহ্মণ প্রধান গাঁ। ধর্ম ও শাস্ত্রচর্চায় বেশ নাম আছে এখানকার ব্রাহ্মণদের। রামকানাই ঘোষাল নিজেও ধর্মপ্রবণ এবং শাস্ত্রজ্ঞ। এজন্যে সমাজে তার একটি খাতির আছে। পাঁচজনে তাকে মানে। কিন্তু যে যতই তাকে খাতির করুক, তার এই ইচ্ছাটাকে সমর্থন করতে পারল না কেউ। বরং তার স্ত্রীর আপত্তিটার প্রতিই সহানুভূতি জানাল সবাই। সবাই বলতে লাগল, পুত্রের মধ্যে দিয়ে পুণ্য অর্জন করতে চাইছে রামকানাই। ব্রহ্মলাভের বাসনা যদি এতই জেগে থাকে রামকানাই-এর তাহলে সে নিজেই তো সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। দুধের ছেলেকে ঘরছাড়া করবার চেষ্টা কেন?

এর উত্তরে রামকানাই বললেন, তিন চারটি ছেলের মধ্যে একটি যদি সন্ন্যাসী হয় তো ক্ষতি কি? সব ছেলেই আমার চিরদিন শুধু ভূমি নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে, কেউ কোন ভূমাকে চাইবে না বা পরমার্থের চিন্তা করবে না, এটা ভাবতেও আমার বড় কষ্ট হয়।

অবশেষে রামকানাইয়েরই জয় হলো। বহুদিন পর মনোবাসনা পূর্ণ হলো তার। তখন আনুমানিক ১১৩৮ সাল, চতুর্থ পুত্র জন্মলাভ করবার কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রীর সম্মতি মিলল। ঠিক হলো, তাদের এই চতুর্থ পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করলে তিনি কোন আপত্তি করবেন না। কিভাবে কোন রহস্যময় কারণে কমলাদেবীর মতের সহসা পরিবর্তন হলো তা কেউ জানতে বা বুঝতে পারল না। রামকানাই নিজেও না। তবু যেভাবেই হোক স্ত্রীর মত যখন মিলেছে এ বিষয়ে তিনি উল্লসিত না হয়ে পারলেন না।

রামকানাইয়ের মনে হলো এবার স্বয়ং ঈশ্বর তার প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন এবং তিনিই তার স্ত্রীর অনমনীয় মনোভাবের পরিবর্তন সাধন করেছেন। তা যদি না হয় তাহলে মায়ের মন কিছুতেই স্বেচ্ছায় ছাড়তে চাইত না তার সন্তানকে।

আর একটা অপূর্ব সুযোগ মিলে গেল। রামকানাইয়ের মনে হলো, এটা ঈশ্বরের দান। ভগবান গাঙ্গুলীর মত সর্বশাস্ত্রের সাধক তাদের গাঁয়েই রয়েছেন। রামকানাই ঠিক করলেন, গাঙ্গুলী মশাইয়ের হাতে পুত্রের সব ভার সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। তার মনে হলো, তার এই পবিত্র আশা পূরণের পথে আর কোন বাধাই আসবে না, এলেও তা টিকবে না।

ছেলের নাম রাখা হলো লোকনাথ।

লোকনাথের ছেলেবেলায় কিন্তু এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়নি। অন্যান্য ছেলের মত লোকনাথও ছিলেন দুরন্ত। তবে তাঁর বুদ্ধি ছিল বড় তীক্ষ্ণ। খুব বেশি ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা বা হৈ চৈ পছন্দ করতেন না লোকনাথ। একমাত্র বেণীমাধব ছাড়া আর কারো সঙ্গ ভাল লাগত না তাঁর। সমবয়সী বেণীমাধবও ছায়ার মত অনুসরণ করতেন তাঁকে। সব সময় কাছে কাছে থাকতেন দু'জনে।

লোকনাথ ও বেণীমাধব দু'জনেই একসঙ্গে পাঠশালায় যেতেন। দু'জনেরই বাল্যশিক্ষার ভার ভগবান গাঙ্গুলীর উপর ছিল ন্যস্ত। সাধারণত ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে উচ্চশিক্ষার জন্য বয়স্ক ছাত্ররা আসত বিভিন্ন জায়গা থেকে। ছোট ছোট ছেলেদের তিনি না পড়ালেও লোকনাথ ও বেণীমাধবের বেলায় তার এ নিয়ম নিজেই ভঙ্গ করেন তিনি। তাঁদের মেধার পরিচয় পেয়ে এক কথাতেই রাজি হয়ে যান ভগবান গাঙ্গুলী। তাঁদের আচার্যরূপে তাঁদের শিক্ষার সব ভার গ্রহণ করেন।

লোকনাথের বয়স তখন সবেমাত্র দশ কি বারো। রামকানাই ঠিক করলেন, এবার ছেলের উপনয়ন কার্য সম্পন্ন করাবেন। রামকানাইয়ের দেখাদেখি বেণীমাধবের অভিভাবকও তাই ঠিক করলেন। এদিকে ভগবান গাঙ্গুলী হঠাৎ ঘোষণা করে বসলেন, উপনয়ন কার্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লোকনাথকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে চিরদিনের জন্য সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবেন। কোথায় গিয়ে প্রথমে উঠবেন কিছুই তার ঠিক নেই।

ছেলের বয়স যত বাড়ছিল, মায়া মমতাও ততই বেড়ে উঠছিল। আরো কিছুদিন গেলে হয়ত ত্যাগ করা অসম্ভব হয়ে উঠত। তবু কথাটা নিজের মুখে বলতে পারছিলেন না রামকানাই। তাই আচার্যদেব নিজেই যখন একথা তুললেন তখন নিশ্চিন্ত হলেন রামকানাই।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে বিচলিত হয়ে উঠলেন বেণীমাধব। তিনি যাবার জন্য জেদ ধরলে প্রথমে তাঁর কথার বিশেষ গুরুত্ব দিল না কেউ। সবাই ভাবল, বন্ধুর আসন্ন বিরহে কাতর হয়েই একথা বলছে। দু'দিন পরে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এই জেদ ক্রমশঃ যখন চরম পর্যায়ে উঠল, তখন আশ্চর্য হয়ে গেল সকলে। সামান্য বালক বয়সে বন্ধুপ্রীতির জন্য যে ছেলে ঘরের সমস্ত আরাম উপভোগ

ও বাপ মার স্নেহ উপেক্ষা করে সন্ন্যাসী হতে চায় সে সাধারণ ছেলে নয়। আসলে হয়ত গৃহত্যাগ তার বিধিনির্দিষ্ট, বন্ধুপ্রীতি উপলক্ষ মাত্র। ভগবান গাঙ্গুলীও বেণীমাধবকে সঙ্গে না নিয়ে পারলেন না।

দশ বারো বছরের দুটি ব্রহ্মচারী বালককে নিয়ে ভগবান গাঙ্গুলী যেদিন গাঁ ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে গেলেন, সেদিন গাঁয়ের সব লোকই জড়ো হয়েছিলো। অনেকের চোখে জল এল। ভাবল এ দৃশ্য বড় করুণ, বড় মর্মান্তিক। আবার অনেকের মনে হল এ দৃশ্য পবিত্র। সাংসারিক ভোগ সুখ ও ধনসম্পদের ঊর্ধ্বেও যে একটা পরম বস্তু আছে, এ দৃশ্য সেই কথাই মনে করিয়ে দেয় সকলকে।

লোকনাথ ও বেণীমাধবকে নিয়ে কয়েক দিন ধরে পথ হেঁটে প্রথমে কালীঘাটে এসে উঠলেন ভগবান গাঙ্গুলী। মা-কালীর পীঠস্থান হিসেবে তখনো নাম ছিল কালীঘাটের। তবে কোন উন্নতি হয়নি জায়গাটার। আদিগঙ্গার দু'পাশে ছিল ঘন বন আর মাঝে মাঝে দু-একটা জলা। এই ঘন বন সমাচ্ছান্ন দুর্গম অঞ্চলটিকে তখন সাধারণ মানুষ এড়িয়ে গেলেও সাধুদের কাছে এ জায়গাটি ছিল বড় প্রিয়। বহু দূর দূরান্ত থেকে বহু সন্ন্যাসী এসে সেকালের কালীঘাটের সেই ভীষণ আরণ্যক নির্জনতাকে বেছে নিতেন নিজেদের সাধন ভজনের জন্য।

ভগবান গাঙ্গুলীও তাই এত জায়গা থাকতে প্রথমে কালীঘাটেই গিয়ে উঠলেন। কিন্তু গিয়ে দেখলেন, তার আগেই অনেক সাধু এখানে সেখানে আস্তানা পেতে বসে আছে।

কালীঘাট জায়গাটা ভালই লেগে গেল লোকনাথ ও বেণীমাধবের। এত অল্প বয়সে বাপ মা ছেড়ে এত দূরে এসে এত সহজে নতুন জায়গায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে তারা, ভগবান গাঙ্গুলী তা ভাবতেই পারেননি। কিন্তু তখন বুঝলেন, বৈরাগ্যের ভাব নিয়েই জন্মেছে যেন ওরা। ভাল পোশাক ছেড়ে ব্রহ্মচারীর বেশ পরেছে। ঘর বাড়ি বাপ মা আত্মীয়স্বজন খেলার সাথী সব ছেড়ে এসেছে, তবু এতটুকু মনোকষ্ট নেই ওদের তার জন্য।

তবে ছেলেমানুষির ভাবটা যায়নি তখনো। উপরে ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করলেও বাল্যসুলভ চপলতাটা জেগে ওঠে তখনো মাঝে মাঝে। গুরুদেবের চোখ এড়িয়ে প্রায়ই এ-গাছে সে-গাছে উঠে খেলা করেন লোকনাথ আর বেণীমাধব। কখনো কখনো আদিগঙ্গায় নেমে সাঁতার কাটেন। তবে সবচেয়ে মজা লাগে এতগুলি সাধুকে এক জায়গায় দেখে। পরনে কৌপীন, মাথায় বিরাট জটা। দেখে মনে হত, এরা যেন এক একটি অদ্ভুত জীব।

গাঁয়েতে যখন কখনো কখনো দুই-একজন সাধু-সন্ন্যাসী যেত তখন তাদের দেখে ভয় হত। কিন্তু এখন ভয়ের পরিবর্তে কৌতূহল জাগে লোকনাথ ও বেণীমাধবের। হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে ইচ্ছে হয় জটাগুলোকে। জানতে ইচ্ছা করে, কি করে এমন জটা তেরি হয় সামান্য চুল থেকে।

সাধুরা যখন চোখ বন্ধ করে ধ্যানে বসতেন তখন লোকনাথ ও বেণীমাধব চুপি চুপি এসে প্রথমে তাঁদের মাথার জটায় ও পরনের নেংটিতে হাত দিতেন। তারপর যখন দেখতেন কেউ কিছুই বলছেন না তখনি জোরে টান দিয়ে ছুটে পালাতেন। একদিন সাধুরা সকলে মিলে অভিযোগ করলেন ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে।

ভগবান গাঙ্গুলী তার উত্তরে বললেন, ওরা তো আপনাদের পথেরই লোক। বয়সে নিতান্ত বালক বলে সাধন-ভজনের মর্ম কিছুই বোঝে না। একে একে ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিন।

তারপর লোকনাথকে ডেকে গাঙ্গুলীমশায় বললেন, তোমরা বড় হলে তোমাদেরও তো অমনি জটাভার হবে, অমনি নেংটি থাকবে, তখন যদি কেউ তা ধরে টান দেয়, তাহলে কেমন লাগবে বলত?

এইভাবে সেদিন তাঁর বালক শিষ্যদের সাধকদের প্রকৃত ধর্ম সম্বন্ধে আভাস দিয়েছিলেন গাঙ্গুলীমশায়। প্রকৃত সাধকরা সবকিছুকে আত্মার মত দেখে। তাদের আপন পর বলে কোন ভেদ থাকে না।

এরপর সাধনার সুবিধার জন্য আরও গভীর বনের দিকে চলে যান ভগবান গাঙ্গুলী। কারণ বন যেখান যত গভীর যত নির্জন, সেখানে মনঃসংযোগের তত সুবিধা। শিষ্যদের এবার শাস্ত্রসম্মত উপায়ে গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

লোকনাথ ও বেণীমাধবের এবার শুরু হলো ব্রহ্মচর্যসাধন। চলতে লাগল দীর্ঘ ব্রত উপবাস ও কৃচ্ছসাধন। কিন্তু ব্রতসাধন যত কষ্টেরই হোক না কেন, কোন কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হত না তাঁদের। গুরুদেবের গভীর মমতা ও স্নেহযত্নের স্নিগ্ধ স্পর্শে সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যেত।

বৃদ্ধ বয়সে নিজে দূর গাঁয়ে গিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভিক্ষার যোগাড় করে নিয়ে আসতেন ভগবান গাঙ্গুলী। তবু শিষ্যদের পাঠাতেন না। বলতেন, তোরা এখন বয়সে যুবক, মন এখনো সেরকমভাবে গড়ে ওঠেনি। লোকালয়ে গৃহস্থদের নানারকমের আচার ব্যবহার দেখলে মনে নানারকমের বিকার দেখা দিতে পারে। তাতে তোদের একনিষ্ঠ যোগসাধনার ব্যাঘাত ঘটবে।

এইভাবে যতদূর সম্ভব শিষ্যদের মঙ্গলের কথা ভেবে চলতেন গাঙ্গুলী মশায়। যতদূর সম্ভব তাদের কষ্টের লাঘব করবার চেষ্টা করতেন। এমনি করে দেখতে দেখতে পঁচিশটি বছর কেটে গেল। কোনদিকে কেমন করে কেটে গেল দিনগুলো তা যেন বুঝতেই পারলেন না লোকনাথ ও বেণীমাধব। শুধু দেখতে পেলেন যৌবনের পূর্ণতা নেমে এসেছে যেমন তাঁদের দেহে, তেমনি তাঁদের গুরুদেবের দেহে বার্ধক্যের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

কিন্তু শুধু যেন দেহেই বৃদ্ধ হয়েছেন তাঁদের গুরুদেব। মন আছে তেমনি আগেকার মত। সাধনার সংকল্পটি মনের মধ্যে আজও আছে তেমনি অটুট। স্নেহের স্রোতোধারা আছে তেমনি অবারিত, ব্যবহারের মাধুর্য আছে তেমনি অক্ষুন্ন। (চলবে)

তরীকত তত্ত্ব ২২

(পূর্ব প্রকাশের পর)

মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কুরআনের ভাষায় বলেন ঃ 'একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই প্রত্যেক খোদাবিশ্বাসীর আত্মনির্ভর হওয়া কর্তব্য।' রাসুলে খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ তুমি যখন কিছু কামনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই তা কামনা করবে। আর তুমি যখন কোন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখনও তুমি তা আল্লাহ্‌র নিকটই সাহার্য প্রার্থনা করবে।' আল্লাহ্‌র প্রতি এইরূপ আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করার নামই পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল।

মহব্বত ঃ ভালবাসা ঃ প্রেম-প্রীতি

একমাত্র আল্লাহ্র প্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়াই প্রকৃত মহব্বত। আল্লাহ্র প্রেমে হৃদয় বিগলিত হয়ে যাওয়া অথবা আল্লাহ্ পাকের ভালবাসায় মন-প্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে উঠা এবং আল্লাহ্ পাকের ভালবাসা ছাড়া আর কারো ভালবাসা হৃদয়ে স্থান না পাওয়ার নামই প্রকৃত মহব্বত বা এশকে এলাহী। যেমন আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কুরআনের ভাষায় বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন এবং তারাও আল্লাহ্কে ভালবাসে।' আল্লাহ্র সাথে বান্দাহ্র এইরূপ গভীরতম ভালবাসায় আবদ্ধ হওয়ার নামই প্রকৃত এশ্ক বা হুব্বুল্লাহ্।

শউক ঃ এশতিয়াক

আল্লাহ্ পাকের দীদার বা তাঁর দর্শন লাভের আকাঙ্খায় উদ্বিগ্ন ও উৎসুক্য হয়ে উঠার নামই শউক ও এশতিয়াক। যেমন মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কুরআনের ভাষায় বলেন ঃ 'যারা আল্লাহ্ পাকের দীদার বা তাঁর সাক্ষাৎ লাভের আশা পোষণ করে, তাদের জন্য অবশ্যই সেই নির্ধারিত সময় প্রায় সমাগত বা আসন্ন।' অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের দর্শন লাভের তীব্র বাসনায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠা তরীকতপন্থী আশেকের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

রেযাবিল কাযা ঃ অদৃষ্টে সন্তুষ্টি

ভাগ্যের প্রতি প্রসন্ন থাকা বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, রোগ-শোক প্রভৃতি যা কিছু মানুষের ভাগ্যে নিত্য অবধারিত, অর্থাৎ ভাল-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল, কল্যাণ-অকল্যাণ প্রভৃতি যা কিছু নিত্য মানুষের ভাগ্যে ঘটছে, তৎপ্রতি প্রসন্ন থাকা এবং তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করে বরং সন্তুষ্টিচিত্তে ও হাসিমুখে তা বরণ করে নেবার নামই রেযাবিলকাযা। অর্থাৎ ভাগ্যের প্রতি প্রসন্ন থাকা। দুর্ভাগ্যজনিত ঘটনার জন্য অন্তরে কোনরূপ যাতনা অনুভূত না হওয়া। অথচ আল্লাহ্ পাকের প্রতি প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার মাত্রা চরম পর্যায়ে পৌঁছলে খোদা প্রেমিকের জন্য শারীরিক কোন দুঃখ-কষ্টই অনুভূত হয় না। রাসুলে খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্তালা মানুষের ভাগ্যে যা নির্ধারিত করে রেখেছেন, এতে সন্তুষ্ট থাকাই সৌভাগ্যের কারণ।'

উনস ঃ প্রেমাস্বাদন

আল্লাহ্ পাকের মহব্বত বৃদ্ধি পেলে যে অতুলনীয় শান্তি ও আনন্দ হৃদয়ে অনুভূত হয়, তাকেই বলা হয় উনস বা পরম প্রেমের আস্বাদন। যেমন মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কুরআনের ভাষায় বলেন ঃ 'খোদাপাকই খোদা-বিশ্বাসীদের অন্তরে পরম শান্তি দান করে থাকেন।'

নিয়ত ঃ সৎ-সংকল্প

সৎ-উদ্দেশ্যে ও সৎ বাসনায় কোন কিছু করার ইচ্ছাকেই নিয়ত বলে। তজ্জন্য প্রত্যেক কাজ কর্মের মূলে সৎ উদ্দেশ্য থাকা চাই। কেননা, আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। আল্লাহ্র রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ ০ ('ইন্নামাল আইমালু বিন্নিয়াতি') 'নিয়তের উপরই নির্ভর করে কার্যাদি সুফল, অর্থাৎ সংকল্প অনুযায়ী কৃতকর্মের ফল লাভ হয়।'

এখলাস ঃ হৃদয়ের বিশুদ্ধতা

আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে বিশুদ্ধ মনে নিষ্ঠার সাথে কোন কিছু করাকেই এখলাস বলে। আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের একক বাসনা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন কামনা-বাসনা মিশ্রিত না হওয়াকেই এখলাস বলে। যেমন আল্লাহ্তালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তাঁর এবাদত বন্দেগী করাকেই এখলাস বুঝায়। যেমন মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কুরআনে এখলাস বা বিশুদ্ধমনে তাঁর এবাদত-বন্দেগীর নির্দেশ দান করেছেন। এ সম্পর্কে রাসুলে খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ 'যখন কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে উত্তমরূপে নামায সমাধা করে এবং নির্জনেও সে তদ্রুপই নামায সমাধা করে, তখন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ 'এই ব্যক্তিই আমার একমাত্র খাঁটি বান্দাহ্।'

সিদ্ক্ ঃ আত্মবিশ্বাস

দৃঢ়-আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে পরিপূর্ণরূপে কোন কিছু করাকেই সিদ্ক্ বলে। যেমন এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কুরআনের ভাষায় বলেন ঃ 'তারাই সত্যিকার আত্মবিশ্বাসী বান্দাহ্, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপন করেছে। অতঃপর তারা তাদের এই আত্মবিশ্বাসে ইতস্ততঃ করেনি, বরং তারা তাদের স্বীয় জান-মাল দ্বারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করেছে; তারাই সত্যপরায়ণ খোদা-বিশ্বাসী বান্দাহ্।'

কেনায়াত ঃ স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকা

স্বল্পে পরিতুষ্ট থাকা এবং এই ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করা যে, আমার ভাগ্যে যা ছিল, তা-ই আমি পেয়েছি। মনে এইরূপ সান্ত্বনা দেবার নামই কেনায়াত। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ 'কেনায়াত একটি অফুরন্ত অবদান।'

মুরাকাবা ঃ আল্লাহ্র ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন থাকা

হৃদয়ে সর্বক্ষণ এইরূপ একটি স্থায়ী ধ্যান-ধারণা পোষণ করা যে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞাতা। তিনি আমার সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে সবকিছুই দেখছেন ও শুনছেন। সুতরাং আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টির পরিচায়ক কোন কিছু বলা-কওয়া ও শোনা-করা থেকে বিরত থাকাই প্রকৃত মুরাকাবা। আল্লাহ্ পাকের গোপন যিকির ও মহব্বত দ্বারা হৃদয় পরিপূর্ণ করে তোলা আশেকের জন্য অত্যাবশ্যক। রাসুলে খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ পাকের 'সার্বক্ষণিক স্মরণ দ্বারা হৃদয়কে ভরপুর করে রাখ। তাহলেই তাঁকে তোমার সামনে দেখতে পাবে।'

ফিক্র ঃ চিন্তামগ্ন থাকা ঃ আত্ম-গবেষণায় লিপ্ত হওয়া

দুইটি জানা বিষয় দ্বারা তৃতীয় বিষয়টির অস্তিত্ব আবিষ্কার করার নামই ফিক্র এবং এইরূপ আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হওয়া যে, কেবল ঐশী জগতই একমাত্র 'অবিনশ্বর' জগত। এই আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে তা গ্রহণ করাই সর্বোত্তম। এই দুইটি জানা বিষয় থেকে তৃতীয় বিষয়টি পাবার বাসনা হৃদয়ে উদয় হয়। তৃতীয় বিষয়টি হলো, পরম চিরন্তন সত্তায় পৌঁছার বাসনা। যেমন রাসুলে খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ 'তোমরা এই নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল বিষয়াদি পরিহার করে অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী বিষয় গ্রহণ কর।' আর তা হলো, খোদাপাকের দীদার লাভ।

প্রভৃতি সৎ-গুণাবলী অর্জনের নিমিত্ত পীরে কামেলের সাহচার্য লাভ করা অপরিহার্য কর্তব্য। তাতে চরিতার্থ হতে পারলেই খোদাতালার খলীফা হবার যোগ্যতা লাভ হয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টি জগতের গূঢ় রহস্য জানা যায়। আর এইরূপ মানুষই ইনসানুল কামেল বা পরিপূর্ণ মানব রূপে

আখ্যায়িত হয়ে থাকেন; অথচ পরিপূর্ণ মানবই আল্লাহ্‌র স্থলে অবস্থান করেন এবং ইহকাল ও পরকালের পরিচালনার দায়িত্বভার বহন করে থাকেন। এই দায়িত্বভার দুই ভাগে বিভক্ত; যথা-কুতুবিয়ত ও গাউসিয়ত। (চলবে)

সংগৃহীত ঃ সূফীতত্ত্বের আত্মকথা
লেখক ঃ মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী

সমাজ সংস্কারে ইসলাম

॥ মোতাহের হোসেন চৌধুরী ॥

কোন মানুষ আল্লাহ ব্যতীত কাহারও দাস নহে। এমন কি সে রাষ্ট্রেরও দাস নহে। মোমিনের নির্দেশই আল্লাহর নির্দেশ। সুতরাং কোন মানুষ মোমিনের নির্দেশ ব্যক্তি জীবনে বা সমাজ জীবনে নিজে পালন না করিলেও ইহার বিরোধিতা করিতে পারিবে না।

সমাজের সুযোগ সুবিধা ভোগ করার এবং সমাজে বসবাস করার অধিকার সবার সমান। কিন্তু সমাজ পরিচালনার জন্য শীর্ষস্থানীয় প্রশাসনিক কাজ নিয়ন্ত্রণের ভার শুধুমাত্র মোমিনগণের উপর ন্যস্ত থাকিবে। বাকি সকল কাজে মুসলমান, কাফের, মোনাফেক, ফাসেক, মোশরেক ইত্যাদি সর্বপ্রকার লোককেই নিয়োগ করা যাইবে, কিন্তু তাহারা কোন মতবাদই প্রচার করিতে পারিবে না। এর কারণ, ইসলামে শাসন বিধানের উপর পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের গণতান্ত্রিক অধিকার নাই। সুতরাং মোমিনগণের নির্দেশ ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোনরূপ মতবাদ সঠিক প্রচারের যোগ্যতা রাখে না বলিয়া তাহার প্রচার অধিকার থাকিবে না। কুরআন হইতে ধর্ম বিষয়ক ব্যাখ্যা প্রদানে জনসাধারণ এই নীতি গ্রহণ না করায় কুরআনের জীবন দর্শন মানুষের অবগতির বাহিরে রহিয়া গিয়াছে।

বস্তু উৎপাদন এবং বন্টন নিয়ন্ত্রণের নানাবিধ বিধি-ব্যবস্থার পরামর্শ যে কেহ দিতে পারিবে, যদিও উহা গ্রহণ করা বা না করার বিষয়টি মোমিনগণের নিয়ন্ত্রণেই থাকিবে।

ধর্মীয় ওয়াজ নসিহত মোমিন বা মোমিন দ্বারা মনোনীত ব্যক্তি ব্যতীত কেহ জনসমাবেশে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে বক্তব্য রাখিতে পারিবে না। কেবলমাত্র সরকারের দ্বারা নিয়োজিত অথবা অনুমোদিত ব্যক্তিগণই ধর্মপ্রচারের কাজ করিতে পারিবে।

সর্বযুগের সকল ধর্ম ইসলাম। শেষ নবীর ইসলাম যেহেতু সার্বজনীন ধর্ম এবং সর্বধর্মের সমন্বয়, সেহেতু ইহার বিধানগুলি সকলের জন্য সমভাবে গ্রহণযোগ্য হইবে। বর্তমানে প্রচলিত তথাকথিত ইসলামের প্রেক্ষিতে বিচার করিলে অবশ্য ইহার কোন অংশই সার্বজনীন প্রমাণিত হইতে পারে না। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র কুরআনের ভাষার মধ্যেই কেবল প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং তাহা প্রবল বিরোধিতার কারণে কোন কালেই প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায় নাই।

জীবন দর্শন এবং জীবন বিধান এক নয়। কুরআন একটি ধর্ম বিধান নয়। ইহা মানব জাতির জন্য একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন দর্শন। জ্ঞানীগণ ইহার নির্দেশ অনুযায়ী ধর্ম বিধান বা জীবন বিধান রচনা করিলে তাহা হইবে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। প্রচলিত ইসলাম-ধর্ম অপূর্ণাঙ্গ এবং বিকৃত একটি জীবন ব্যবস্থারূপে বিভিন্ন পরিস্থিতির চাপে সৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে। জীবন দর্শন হইতে জীবন-বিধান রচনা কার্যটি ধর্ম নিরপেক্ষ পরম জ্ঞানী ব্যক্তি দ্বারা রচিত না হইলে ইহার পরিণতি এইরূপ হইয়াই থাকে। এবং এই অবস্থায় জীবন-দর্শন হইতে জীবন-বিধান বা "ধর্ম" বিচ্ছিন্ন হইয়া উহা মুক্তি-মুখী না হইয়া মূলত অনুষ্ঠান-মুখী হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মদী ইসলাম একটি ফিৎরাতী (অর্থাৎ প্রাকৃতিক) ধর্ম। অপরপক্ষে কুরআন ফিৎরাতী জীবন-দর্শন। ইহা ধর্ম নয়। ইহা হইতে মোমিনগণ ধর্ম-বিধান বা জীবন-বিধান রচনা করিয়া জনগণকে মুক্তির দিকে আগাইয়া নিবেন। মোমিন ব্যতীত অন্য কাহারও রচিত ধর্ম মুক্তির দিশারী হইতে পারে না। রসুলাল্লাহ বলিয়াছেন ঃ আলী যে দিকে মোড় নেয় আল্লাহর দ্বীন সে দিকেই মোড় নেয়।

ফিৎরাত অর্থ ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা ধ্বংস। মন এবং দেহের ধ্বংসকেই ফিৎরাত বলে। যেহেতু আল্লাহর সৃজিত প্রকৃতির নিয়মে দেহ-মনের এই ধ্বংস স্বাভাবিক নিয়মের দ্বারা হইয়াই চলিয়াছে সেইজন্য যে বিধানের দ্বারা দেহ ও মন সহজে ধ্বংস হইয়া যায় অর্থাৎ পুনরায় উভয় সংযোজিত হইয়া পুনর্জন্মে আর আসে না সেই বিধানকে ফিৎরাত ধর্ম বলে।

আল্লাহ হইলেন "ফাতেরীস্ সামাওয়াত অল্ আর্দ" অর্থাৎ দেহ-মনের ধ্বংসকারী। দেহ-মনের সংমিশ্রণের দ্বারা পুনর্জীবনে না আসিয়া দেহ-মনের ধ্বংসের মাধ্যমেই মানুষ মুক্তি পাইয়া থাকে। ইসলাম দেহ-মনের ধ্বংস সাধন বিষয়টি সহজে সম্পন্ন করিয়া এই মুক্তির ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করে বলিয়াই ইহাকে ফিৎরাতী ধর্ম বলে।

যে কোন ধর্মাবলম্বী প্রকৃত ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করিলে (অর্থাৎ আপন রবের নিকট বা সম্যক গুরুর নিকট সঠিক আত্মসমর্পণের ধর্ম অনুসরণ করিলে) তাহার পুনর্জন্ম হইবে না। এইরূপে বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃত ইসলামে পুনর্জন্ম নাই।

যাহারা বলে ইসলামের কিছু মানি এবং কিছু কথা মানি না কুরআন মতে তাহারা ধর্মদ্রোহী কাফের। বর্তমান জগতে কুরআনে বিশ্বাসকারীগণের অধিকাংশ এই মত পোষণ করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে কুরআনের কোন কোন কথা বাদ দিলেও মুসলমান থাকা যায়। তাহাদের মনের ভাবটি হইল ঃ কুরআন মধ্যযুগীয় সুন্দর একটি জীবন ব্যবস্থা। এ যুগে তা হুবহু প্রয়োগ করিলে অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।

উপরে উল্লেখিত সমাজ বিধান কোন সমাজে অনুপস্থিত থাকিলে উহা ইসলামিক রাষ্ট্র নহে। এবং ঐ রাষ্ট্রের বিধি-নিষেধ পালনকারী জনগণ মুসলিম নহে।

মোট কথা ইসলামকে বুঝিবার এবং ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করিবার জ্ঞান যাহাদের ছিল না এবং কোন কোন বিষয়ে জ্ঞান থাকিলেও উহা সমাজে রূপায়িত করিবার ইচ্ছা যাহাদের ছিল না এমন লোকেরাই মোহাম্মদী দ্বীন দখল করিয়া তাহার কর্তা সাজিয়া বসিল এবং ক্রমশ ধর্মকে উহার মূল ভিত্তি হইতে সরাইয়া শুধুমাত্র অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করিয়া রাষ্ট্রকে ধর্ম হইতে আলাদা করিয়া ধর্মের নামে অধর্মের রাষ্ট্র রচনা করিয়া চলিল।

মোমিন ব্যতীত অন্য কেহ ধর্মীয় বিধান দিলে তাহা দ্বারা ইসলামী সমাজ সংগঠন হইতে পারে না। সম্রাট মাবিয়ার রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সকল উমাইয়া এবং আব্বাসী সম্রাটগণ যে সকল ধর্ম বিধান ইসলামের নামে জারি করিয়াছিলেন তাহার কোনটাই মোহাম্মদী ইসলাম সম্মত ছিল না। তাহারা অনায়াসে রাজকীয় দানব শক্তির বলে ভ্রান্তিমূলক ধর্ম প্রতিষ্ঠায় নিশ্চিত সফলতা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। সম্রাট মাবিয়ার পূর্ব হইতেই বিভ্রান্তির সূচনা হইলেও তখন উহার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিশ্চিত ছিল না। কারণ তখনও মোমিনের প্রভাব পরোক্ষ হইলেও সমাজ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

ধর্মে নিষ্ঠা যাহাদের নাই, ধর্মীয় জীবন দর্শন যাহারা বুঝে না এবং অনুষ্ঠান ধর্মকেই যাহারা ধর্ম মনে করে তাহারাই মোহাম্মদী ইসলামকে

সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক ইসলামে পরিণত করিয়া জগত হইতে ইহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছিল।
এইরূপে আমরা দেখিতে পাই উমাইয়া এবং আব্বাস রাজশক্তির কবলে পড়িয়া ইসলামের অবশিষ্ট প্রাণশক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর কখনও তাহা জাগিয়া উঠে নাই।
মোমিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইসলামের নীতিতে নীতিবাদী একটা গোষ্ঠির যে কোন একজনের নিকট সমর্পিত ব্যক্তিকে মুসলিম বলে। এইরূপ নীতিবাদী কোন গোষ্ঠি বা দল যেখানে নাই সেখানে মুসলিম বা মুসলমান হওয়া যায় কেমন করিয়া? অর্থাৎ মুসলিম কোন দল থাকিলেই কেবল সেই দলে যোগ দান করিয়া মুসলমান হওয়া যায়। দলের নিকট আত্মসমর্পন করিয়া মোহাম্মদী মুসলিম হওয়ার সুযোগ যেমন জগতে নাই, সেই একই কারণে খৃষ্টিয় মুসলিম হওয়ার সুযোগও জগতে কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা বিরাট একটি মুসলিম জাতি, তবে কিনা রাজাদের প্রণীত মিথ্যা ধর্ম নীতির নিকট সমর্পন করিয়া অর্থাৎ আসলেম করিয়া মুসলিম হইয়াছি - যে নীতি সমূহ আল্লাহ্-রসুলের নামেই রচিত হইয়াছে।
মোমিন ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিনিধি। উপস্থিত একজন মোমিনের নিকট আত্মসমর্পন না করিয়া নিরাকার কাল্পনিক আল্লাহর নিকট সমর্পন ভাব মনে রাখিলেই মুসলিম হওয়া যায় না। সামাজিকভাবে মোমিন ব্যক্তির উপস্থিতি সমাজে অবশ্য থাকিতে হইবে, এবং ধর্ম পালনে এবং তাহা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সেই মোমিনের স্বাধীন অধিকার থাকিতে হইবে।
গুরুবাদী রাষ্ট্র দ্বারা চিহ্নিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অর্থাৎ মোমিন ব্যতীত কেহই কাহারও মোর্শেদ (অর্থাৎ নির্দেশ দাতা ধর্মগুরু) হইতে যাইবে না। ইহার ফলে পীরপ্রথা দোষ মুক্ত হইয়া সমাজকে ধর্মজ্ঞানে বলিয়ান করিয়া তুলিবে। মোমিনের অনুমোদন ব্যতীত গায়কগণ কোন প্রকার মিথ্যা ধর্মীয় কাহিনী গাহিতে পারিবে না, কারণ ইহাতে ব্যাপকভাবে মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া থাকে।
ধর্মীয় পরিস্থিতি এমন সঙ্কটময় অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে যে, মনে হয় যেন সমাজ হইতে মোমিন খুজিয়া বাহির করা যাইবে না। কারণ সমাজে মোমিন নাই বলিয়াই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে বিকৃত ধর্মীয় সমাজে সংখ্যায় কম হইলেও মোমিনের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিতেই হইবে। তাহা না হইলে মনুষ্য সৃষ্টি একেবারে নিরর্থক হইয়া যায়। সুতরাং বিকৃত ধর্মীয় সমাজেও মোমিনের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় না, যদিও এইরূপ সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে মোমিন তৈরী হয় না। তথাপি অসামাজিক ধারায় পাগল মস্তানরূপে মোমিনের অস্তিত্ব কম হইলেও সমাজে অজ্ঞাতভাবে বিরাজিত থাকে, কারণ মানব জাতীর মধ্যে মোমিনের অস্তিত্ব একেবারেই না থাকিলে পথ প্রদর্শকের অভাবে মানব সৃষ্টির সার্থকতা আর থাকে না। এইজন্য প্রকাশ্য ধর্মীয় শাসন না মানিলেও অপ্রকাশ্যে ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে হইলেও মানব জাতীর মধ্যে আল্লাহর ধর্ম রাজ্য মোমিনগণের দ্বারা তিনি চালাইতেই থাকেন। এইরূপ মোমিনগণ সমাজে মোমিনরূপে চিহ্নিত হইয়া থাকেন না, যদিও তাঁহাদের কেহ কেহ মৃত্যুর পূর্বে ঈমানের অলৌকিক পরিচয় দিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।
এমতাবস্থায় সমাজ পরিচালনার জন্য মোমিন বাছাই করার প্রশ্নে যে অসুবিধার সৃষ্টি হইবে তাহা ইচ্ছা করিলেই সমাজ দূর করিতে পারে। প্রয়োজন কেবল সংঘবদ্ধ ইচ্ছা থাকিলে মোমিন বাছাই করিয়া বাহির করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। এখানেও যদি সমাজ একান্তই ব্যর্থ হয় তাহা হইলে সমাধান দানের জন্য রহিয়াছেন আমাদের মহাপ্রভু হায়াতুন্ নবী (জীবন্ত নবী)। তাঁহার নিকট সমগ্র সমাজ প্রতিনিধিমূলক ভাবে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা জানাইলে তিনি অবশ্যই সেই দেশের মোমিনগণের পরিচয় এবং নাম প্রতিনিধিগণকে জানাইয়া দিবেন। তবে সমগ্র সমাজকে অবশ্যই তাহাদের বিকৃত ধর্মের জন্য অনুতপ্ত হইতে হইবে এবং মহানবীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিতে হইবে। কোন দেশের প্রতিনিধি এককভাবে তাঁহার নিকট এই আরজি পেশ করিলে তিনি সেই ব্যক্তিকে উহা জানাইবার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া হয়তো মনে করিবেন না, কারণ সেই দেশ তাহার কথা গ্রহণে প্রতিশ্রুত নয়।
অতএব বিশ্বনবীকে যদি আমরা পরম হাদীরূপে মানিয়া থাকি তবে আমাদের এই একীন (অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস) অবশ্য থাকিতে হইবে যে, আমরা সব হারাইয়াও কিছুই হারাই নাই, যদি আবার আমরা দলীয় ভেদাভেদ ত্যাগ করিয়া সত্য গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। এইরূপ ব্যবস্তা গ্রহণেও যদি আমাদের অনিহা থাকে তাহা হইলে ইসলামী সমাজ সংগঠন হইবে না।

সংগৃহীত ঃ সদর উদ্দিন আহমদ চিশতীর তফসীরে কোরানুল করিম, তৃতীয় খন্ড।

চীন ঃ ইয়ুন নান প্রদেশে নাচিয়াইং একটি গ্রাম

॥ সংলাপ প্রতিবেদক ॥

দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের ইয়ুন নান প্রদেশের থুং হাই জেলার না কুও থানায় নাচিয়াইং নামে একটি হুই জাতির গ্রাম আছে। নাচিয়াইং গ্রামের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। এখানে চারশো'রও বেশি ইমামসহ বহু সুধী ব্যক্তির উদ্ভব হয়েছে। এদের মধ্যে আছেন চীনের বিখ্যাত আরব ইতিহাস বিষয়ক পন্ডিত, ইউনেস্কোর আরব সংস্কৃতি বিষয়ক শারজাহ্ পুরস্কার জয়ী পেইচিং বিদেশী ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নাচুং এবং নামকরা অনুবাদক নাস্যুন প্রমুখ। এই গ্রাম এখনও ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যে ভরপুর।
প্রতিদিন এই গ্রামের মসজিদ থেকে নামাজ পড়ার জন্য আযান প্রচার করা হয়। নাচিয়াইং গ্রামে মোট সাতশো'রও বেশি হুই জাতির পরিবারের সদস্যরা বসবাস করেন। নাচিয়ারেই নামে একজন বৃদ্ধের বয়স ৭০ বছরেরও বেশি। তিনি সংবাদদাতাকে বলেন, এই গ্রামে বসবাসকারীরা সুখী জীবন কাটাচ্ছেন এবং গৌরব বোধ করেন। কারণ, যারা এই গ্রামে থাকেন, তারা সবাই ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ (সাঃ)-এঁর বংশধর।
১২৯০ সালে লাকুও থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তার বয়স সাতশো'রও বেশি। শাসন করার জন্য নাসুরু নামে একজন কর্মকর্তাকে এই থানায় পাঠানো হয়।

বৃদ্ধ নাচিয়ারেই বলেন, নাসুরু নামে ওই কর্মকর্তা ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এঁর অনুসারী। তার ৪টি ছেলে ছিলো। তিন ছেলে তার সঙ্গে ইয়ুন নানের পাহাড়ী অঞ্চলের একটি স্থানে বসবাস করতে স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে ওই জায়গা ধীরে ধীরে একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে গ্রামটিকে নাচিয়াইং গ্রাম বলা হয়। এই গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া, বিয়ে ও শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এখনও স্বকীয় রীতি-নীতি ও বৈশিষ্ট্য বজায় রয়েছে। এ প্রসঙ্গে নাচিয়াইং গ্রামের মসজিদের ইসলাম ইনস্টিটিউটের প্রধান মা চিয়ান থাং বলেন, নাচিয়াইং গ্রামে অতিথিদের দাওয়াত করার ব্যাপারে সাদাসিধা আয়োজন করা হয়। কোনো অপচয় করা হয় না। সাধারণত ৮ ধরনের ব্যঞ্জন বন্দোবস্ত করা হয়।

নাচিয়াইং গ্রামে গ্রামবাসীদের বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রগাঢ় ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই গ্রামে তরুণ-তরুণীরা বিয়ের আগে বাগদান অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রয়োজন। নইলে তাদের প্রেমকে অন্যায় বলে মনে করা হয়। বাগদান ঐতিহ্যবাহী আচার ব্যবহার অনুযায়ী আয়োজন করা হয়। তারপর তরুণ-তরুণীরা নিশ্চিন্তভাবে প্রেম করতে সক্ষম হবে। বিয়ের জন্য বাগদানের বেশি সময় লাগবে। সাধারণত ২-৫ বছর লাগে। প্রয়োজনে ৮ বছর লাগতে পারে।

বিয়ের অনুষ্ঠানকে আনন্দ ও অন্তরঙ্গ পরিবেশ আরও বৈচিত্র্যময় করে তোলার জন্য অতিথিরা বর-বধূর ওপর মিষ্টি আলু, ডিম ও সয়াবীনের মন্ডা নিক্ষেপ করেন। এতে ভবিষ্যতে বর-বধূর সুখী দাম্পত্য জীবন নিশ্চিত হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে বর-বধূর ব্যবহার্য পোশাক প্রসঙ্গে নাচিয়াইং মসজিদের ইসলাম ইনস্টিটিউটের প্রধান মা চিয়ান খাং বলেন, বিয়ের অনুষ্ঠানে বধূর অধিক ফ্যাশনের পোষাক পরা উচিত নয়। ঐতিহ্যবাহী ও ভদ্রতাপূর্ণ পোষাক পরতে হয়। যদি বধূ পাগড়ী না পরে, তাহলে মসজিদের ইমাম বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির হবেন না।

সংবাদদাতারা নাচিয়াইং গ্রামের মুসলমানদের বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পর্কে যাতে আরও বেশি জানতে পারেন, সেজন্য মা চিয়ান খাং সংবাদদাতাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে ব্যবহার্য বধূদের পরা পোষাকের ভাড়া দোকানে নিয়ে যান। এই দোকানে নানা রকম বৈচিত্র্যয়ম ও রঙবেরঙের বিয়ের অনুষ্ঠানে ব্যবহার্য বধূদের পোষাক দেখা যায়। এতে পরিপূর্ণভাবে সংখ্যালঘু জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে।

এই দোকানে পাগড়ীসহ মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও সৌদি আরব থেকে আমদানিকৃত নানা রকম পোষাক পাওয়া যায়। এই দোকান মুসলিম সংস্কৃতির রূপ লাভ করেছে। এটা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম বিশ্বাসের চাহিদার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নাচিয়াইং গ্রামে দুটি মসজিদ আছে। নাচিয়াইং মসজিদ পুরুষদের এবং নারী মসজিদ নারীদের নামাজ পড়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। নামাজ পড়ার জন্য গ্রামের বয়স্ক, শিশু ও অল্পবয়সীরা মুসলমানদের লম্বা পোষাক ও টুপি পরে ঠিক সময় মসজিদে যান।

নাচিয়াইং মসজিদ তৈরি হয় ২০০৪ সালের ২ অক্টোবর। তার মেঝের আয়তন ১০ হাজার বর্গমিটার। মসজিদে ৭২ মিটার দীর্ঘ চারটি মিনার আছে। উপাসনার বড় ভবনে ৩ হাজার নামাজী নামাজ পড়তে পারেন। এটাও ইয়ুন নান প্রদেশের বৃহত্তম মসজিদ। নাচিয়াইং মসজিদের ইসলাম ইনস্টিটিউটের প্রধান মা চিয়ান থাং বলেন, এই মসজিদ এই গ্রামের গ্রামবাসীদের সাহায্যের অর্থ ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদ নির্মাণ খাতে ২ কোটি ইউয়ানেরও বেশি খরচ করা হয়েছে।

প্রথমে এই মসজিদ নির্মাণের জন্য রক্ষণশীল পদ্ধতিতে ডিজাইন করা হয়েছিলো। পরে মালয়েশিয়ার ডিজাইন অনুসারে পুরনো ডিজাইনের সংস্কার করা হয়েছে। নতুন ডিজাইন অনুযায়ী মসজিদ সমৃদ্ধ আরব বৈশিষ্ট্যে ভরপুর হয়ে উঠেছে।

নারী মসজিদ নাচিয়াইং গ্রামের পুরনো মসজিদ ছিলো। নতুন মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনে পুরনো মসজিদকে আড়াই শো মিটার পূর্বে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। তা নারীদের নামাজ পড়ার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এখন গ্রামের দুটো মসজিদে যার যার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য দেখা দিচ্ছে।

সংবাদদাতারা নারী মসজিদের প্রাচীন ও ভদ্রতাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের জন্য খুব মুগ্ধ হলেন। সিনচিয়াং থেকে আগত একজন উইগুর নারী মুসলমান মা স্যু ইউন সাংবাদদাতাদের বলেন, তিনি ইয়ুন নানের মসিজদ পরিদর্শনের জন্য এই গ্রামে এসেছেন। সিনচিয়াংয়ে মসজিদ উইগুর জাতির স্থাপত্যশৈলীতে তৈরি। হুই জাতির রীতি-নীতি পাওয়া যায় না। তিনি গ্রামের নারী মসজিদে আরবী ভাষা ও ধর্ম বিষয়ক কোর্স পড়াচ্ছেন।

নাচিয়াইং গ্রামের মুসলমানরা ইসলাম ধর্মের নিয়ম-বিধি, আচার ব্যবহার ও চীনের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির প্রভাবে সুষম ও সুখী জীবন কাটাচ্ছেন। তারা আরও সুন্দর জন্মভূমি গড়ে তোলার জন্য পরিশ্রমীভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। ❑

২০০৮: পেইচিং অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী

॥ মোশাররফ হোসেন মূসা ॥

২৯তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস ৮ আগস্ট রাত ৮টায় চীনের রাজধানী পেইচিংয়ে শুরু হয়েছে। এ গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চেয়ারম্যান জ্যাক রগে ভাষণ দিয়েছেন। চীনের প্রেসিডেন্ট হু চিন থাও এবারের অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অলিম্পিক পরিবারের ২০৫টি দেশের ও অঞ্চলের প্রতিনিধিদল ইতোমধ্যে পেইচিং পৌঁছেছেন এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুকুদা ইয়াসুও ও ফরাসী প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজিসহ বিভিন্ন দেশের আশিজনেরও বেশি বিশিষ্ট অতিথিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এক সরকারী হিসাব থেকে জানা গেছে, ১১ হাজারেরও বেশি খেলোয়াড় এ গেমসে অংশ নিচ্ছে এবং এ গেমস সম্পর্কে খবরাখবর পরিবেশনের জন্যে ৩০ হাজারেরও বেশি সাংবাদিক পেইচিংয়ে গিয়েছে। এ দুটি সংখ্যা আলাদা আলাদাভাবে অলিম্পিক গেমস ও অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

জ্যাক রগে তার ভাষণে পেইচিং অলিম্পিক সাংগঠনিক কমিটির এবং অলিম্পিক স্বেচ্ছাসেবকদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পেইচিং অলিম্পিক সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম্যান লিউ ছি তার ভাষণে বলেন, অলিম্পিক গেমস আয়োজনের মধ্য দিয়ে অলিম্পিক চেতনা চীনে ব্যাপক পর্যায়ে প্রচার করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চীনের বিখ্যাত পরিচালক চাং ই মৌ পরিচালিত এক ঘন্টা স্থায়ী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের শিরোনাম হচ্ছে : সুন্দর অলিম্পিক। অনুষ্ঠানে চীনা সংস্কৃতির সঙ্গে অলিম্পিক চেতনার সমন্বয় করে বিশ্বের কাছে মৈত্রী ও সম্প্রীতির চেতনা তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানশেষে ১৯৮৪ সালের অলিম্পিক গেমসে ৩টি স্বর্ণপদক জয়কারী, চীনের বিখ্যাত জিমন্যাস্ট লি নিং এবারের গেমসের প্রধান মশাল প্রজ্জ্বলন করেন।

এবারের গেমসে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন আগের চেয়ে বেশি সংখ্যক খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত বৃহত্তম প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে। এই প্রথম অলিম্পিক গেমস লোকসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম চীনের শহরে এবং তৃতীয়বারের মত এশিয়ার কোনো দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পেইচিং অলিম্পিক গেমস এ মাসের ২৪ তারিখে শেষ হবে।

পেইচিং অলিম্পিক গেমস শুধু চীনা জাতির সভ্যতা প্রদর্শনের মঞ্চ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আড়ম্বরপূর্ণ সাংস্কৃতিক মহা সম্মিলনীও। এবারের অলিম্পিক গেমস চলাকালে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি প্রথমবারের মতো পেইচিংয়ে অলিম্পিক প্রদর্শনী আয়োজনের প্রস্তাব পেশ করেছে। সুইজারল্যান্ডের লোজান অলিম্পিক যাদুঘরের কিছু মূল্যবান জিনিস পেইচিংয়ে প্রদর্শিত হচ্ছে। পেইচিং অলিম্পিক গেমস সাংগঠনিক কমিটির সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিভাগের প্রধান চাও তুংমিং মনে করেন, দেশিবিদেশী প্রদর্শনী এবং ভিন্ন সংস্কৃতির বিনিময় ও মিশ্রণে একই সাথে অনুষ্ঠান করা অলিম্পিক চেতনার প্রতিফলন।

আন্তর্জাতিক নিয়মের সঙ্গে চীনের বৈশিষ্ট্য মেশানোর চেষ্টা করেছে। শুধু কেন্দ্রীভূত করে চীনের প্রাচীন ইতিহাসের সংস্কৃতি দেখানো হয়েছে তা নয় বরং ব্যাপক আন্তর্জাতিক অংশগ্রহনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকীকরণ ও বহুজাতিক সংস্কৃতির বিনিময় ও মিশ্রণের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে।

অলিম্পিক গেমস চলাকালে চীনের নাট্যমঞ্চ বেশ কিছু বিদেশী অভিনয় দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। চীনের বৈদেশিক অভিনয় কোম্পানির উদ্যোগে আয়োজিত "২০০৮ সালের পেইচিং সম্মিলন" নামক সাংস্কৃতিক তৎপরতায় ৩০টিরও বেশি দেশের এক হাজারেরও বেশি শিল্পীর শিল্পকর্ম দেখানো হবে। এ সম্পর্কে কোম্পানিটির প্রধান ব্যাবস্থাপক চাং ইউয়ু বলেন, অলিম্পিক গেমস সারা বিশ্বের উৎসব। ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের নাচগানকে ৫টি সান্ধ্যকালীন নৃত্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সারা বিশ্বের বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পী দল ও শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম একত্রিত হয়ে বিশ্ব সংস্কৃতির মহা সম্মিলনীর পরিবেশ গড়ে ওঠে পেইচিং শহরে।

ম্যাট্রিক্সপরিবেশনায় চীনের "হ্যা" শব্দটির আকার সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শব্দটি দর্শকদের কাছে "সম্প্রীতি"র ধারণা তুলে ধরেছে যা প্রাচীনকাল থেকেই চীনারা পোষণ করে আসছেন।

কাগজ তৈরী, মুদ্রণ, কম্পাস এবং গোলাবারুদ প্রাচীন চীনের চারটি মহা আবিস্কার। মানবজাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পেইচিং অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পকলার মাধ্যমে এই চারটি মহা আবিস্কার পুনরায় আবির্ভূত হয়েছে এবং পাশাপাশি "বিজ্ঞানসম্মত অলিম্পিক গেমসের" ধারণায় চীনের প্রাচীনকালের বৈজ্ঞানিক সাফল্য স্বীকৃত হয়েছে।

জাতীয় স্টেডিয়াম "বার্ড নেস্ট" বিরাটাকারের লিক্যুইড ক্রিসটালস্ক্রীন এল ই ডি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জায়গাটি সীমাহীন আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রধান পরিচালক চাং ইমৌ বলেন, আমরা ৬৪টি কম্পিউটার প্রজেক্টিভ বাতি ব্যবহার করেছি। এটা সবচেয়ে উন্নত মানের কৌশল।

গোটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চলাকালে জাতীয় স্টেডিয়াম "বার্ড নেস্টের" আকাশমন্ডলে উজ্জ্বল রংবেরংয়ের আতশবাজি ফুটানো হয়েছে।

পেইচিং অলিম্পিক গেমসের আতশবাজির আকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর আওতা অতীত অলিম্পিক গেমসগুলোতে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। পেইচিং খিয়েন আনমেন মহাচত্বর থেকে "বার্ড নেস্ট" পর্যন্ত পেইচিংয়ের আকাশমন্ডলে ২৯টি পদচিহ্ন আকারের আতশবাজি ফুটানো হয়েছে। এর অর্থ হলো ২৯তম অলিম্পিক গেমস চীনে এসেছে। পেইচিং অলিম্পিক গেমসের পবিত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার পর "বার্ড নেস্ট" এবং চুইয়ুংকুয়ান মহা প্রাচীরেও একই আকারের আতশবাজি ফাটানো হয়েছে। এর অর্থ হলো, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরিবেশনা "প্রাচীনকাল ও বর্তমানের" এক পদক্ষেপে সময় অতিক্রম করার একটি সংলাপ।

পেইচিং অলিম্পিক গেমসের সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান নকশাকার ছাই কোছিয়াং বলেন, পেইচিং অলিম্পিক গেমসের আতশবাজির বেশ কয়েকটি এই প্রথমবারের মতো সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, আতশবাজির গোলার উল্টা ও সোজা অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কিন্তু এবার একে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে।

এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, অলিম্পিক গেমসের প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জটিল সমস্যার সমাধানে চীন পরপর মোট ১০০ বিলিয়ন রেনমিনপি বরাদ্দ করেছে। ৬ বছরের চেষ্টায় ৬২৫টি নতুন প্রকৌশল উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। অলিম্পিক প্রকল্পগুলোর নির্মানে ৪৬টি নতুন পদ্ধতি, নতুন উপাদান ও নতুন দ্রব্য সৃষ্টি হয়েছে। অলিম্পিক স্টেডিয়ামের নির্মাণে এক সঙ্গে এত বেশি নতুন কলাকৌশল ব্যবহার করা, অলিম্পিক ইতিহাসে এটা প্রথম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে দুজন নভোচারী আকাশ থেকে নেমে আসেন। তারা হালকাভাবে আঙ্গুল চাপ দিয়ে একটি বিরাটাকারের পৃথিবী মডেল "বার্ড নেস্টের মেঝের নিচে থেকে বের করে আনেন। ১৮ মিটার ব্যাস ও ১৬ টন ওজনের এই পৃথিবীর মডেল ৯টি বৃত্তেবিভক্ত। ৫৮জন শিল্পী এর ভিন্ন জায়গায় চলাফেরা করেন। এতে "আমরা এক পৃথিবর অধিকারী" ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে।

বিশ্বের অনেক মানুষ জানেন, কনফুসিয়াস প্রাচীন চীনের একজন মহান চিন্তাবিদ। পেইচিং অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পরিবেশনে কনফুসিয়াসের তখনকার বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্য ঘুরে ঘুরে পরিদর্শনের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। ২০০৮ জন শিল্পী কনফুসিয়াসের আমলের পোশাক পরে হাতে বাঁশের তৈরী বই নিয়ে সংগীতের তালে তালে কনফুসিয়াসের অনেক নামকরা বক্তব্য আবৃত্তি করেন।

কনফুসিয়াস দু হাজার বছর আগে চীনের একজন বিখ্যাত পন্ডিত। তিনি শিষ্টাচার ও সহৃদয়তা প্রচার করতেন এবং নৈতিক শিক্ষা ও মানুষের চেতনা উন্নত করার ওপর গুরুত্ব দিতেন। রু সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা চীনের সংস্কৃতির প্রধান অংশ, এ চিন্তাধারা বিশ্বে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। বর্তমানে কনফুসিয়াস ইতোমধ্যে চীন ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটি সেতুতে পরিণত হয়েছে। ২০০৪ সাল থেকে চীন বিদেশে কনফুসিয়াস ইন্সটিটিউট স্থাপন করতে শুরু করে। চীনা ভাষা পড়ানো ও চীনের সংস্কৃতি প্রচার করা হলো কনফুসিয়াস ইন্সটিটিউটের দুটি প্রধান কাজ। এখন বিশ্বের শতাধিক দেশে কনফুসিয়াস ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বে মোটি তিন কোটি মানুষ চীনা ভাষা শিখেছেন বা শিখছেন।

পেইচিং অলিম্পিক গেমসের কান সু প্রদেশের লান চৌ অঞ্চলের মশালবাহক রাশিয়ানবাসী ইউরি ই লিউ সিং শুধু চীনা ভাষা জানেন তা নয়, চীনের অনেক বিষয়ে তিনি ভালো করে জানেন। তিনি চীনের ফু আর চা খেতে পছন্দ করেন এবং বিখ্যাত পিকিং অপেরা 'পা ওয়ায় পে চি' অর্থাৎ 'রাজার উপপত্নী বিদায়' শুনতে ভালোবাসেন। তিনি বলেন, রাশিয়ায় বেশ কয়েকটি কনফুসিয়াস ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এখন রাশিয়ায় চীনা ভাষা শেখার হিড়িক পড়েছে। অনেকে চীনা ভাষা শিখতে শুরু করেছেন। সারা বিশ্বের অনেক দেশে কনফুসিয়াস ইন্সটিটিউট রয়েছে। এ সব ইন্সটিটিউট বিভিন্ন দেশের মানুষকে চীনা ভাষা শিখতে ও চীনের সংস্কৃতি জানতে উৎসাহী করে। অনেকে, বিশেষ করে অল্পবয়সী যুবকযুবতীরা চীনা ভাষা শিখতে আগ্রহী, তাই এ কথা বলা যায় যে, বিশ্বে কনফুসিয়াস ইন্সটিটিউটগুলোর

প্রভাব বিরাট।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পরিবেশনে 'প্রকৃতি' নামক অধ্যায়ে ২০০৮ জন সাও লিন উ শু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সাদা রংয়ের পোশাক পরে থাই চি ছুয়ান প্রদর্শন করে। থাই চি ছুয়ান চীনের কুংফুর অন্যতম বক্সিং। এ কুংফুর বৈশিষ্ট্য হলো নিস্তব্ধতা ও নম্রতা দিয়ে চঞ্চলতা ও দৃঢ়তা প্রতিরোধ করা, এতে চীনাদের দার্শনিক চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে।
পেইচিং অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অভিনয় পরিবেশনে জাতীয় স্টেডিয়াম - বার্ড নেস্টের বড় পর্দায় চীনের বিখ্যাত প্রাচীন কবি লি পাইয়ের কবিতায় বর্ণনা করা দৃশ্য দেখানো হয়েছে। লি পাই তার কবিতায় লিখেছেন, জলপ্রতাপের পানি এক হাজার মিটার উচু থেকে দ্রুত পড়ছে, ঠিক যেন আকাশ হতে স্বর্গের জলধারা পৃথিবীতে নেমেছে। এই দৃশ্য দেখার পাশাপাশি স্টেডিয়ামে অনেক ছেলেমেয়ে হাতের তুলি দিয়ে চীনের নদী ও পাহাড়ের ছবি আঁকছে। এতে পেইচিংয়ের সবুজ অলিম্পিকের চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে।
পরিবেশ সমস্যা মানবজাতির সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা। এ সমস্যা যুদ্ধ ও বিভিন্ন দেশের সংঘর্ষের চেয়েও গুরুতর।
চীনের ঐতিহাসিক সংস্কৃতিতে কুংফু বিশ্ববাসীদের প্রিয় উপাদান। হলিউডের ছায়াছবিতেও চীনা কুংফু সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে। এ বছর বিশ্বের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হলিউডের ছবি 'কুংফু পান্ডা'-তে চীনের সংস্কৃতির দুটি উপাদান - কুংফু পান্ডাকে সমন্বয় করা হয়েছে।
ছায়াছবি 'কুংফু পান্ডার থীম গানে বলা হয়েছে, সবাইকে কিছু না কিছু কুংফু জানতে হবে। থাই চি ছুয়ান চীনের সবচেয়ে জনপ্রিয় কুংফু। পেইচিং অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাই চি ছুয়ানের পরিবেশনা চীন তথা বিশ্ব সংস্কৃতিতে কুংফুর অবস্থান এবং শরীর চর্চায় সক্রিয় অংশ নেয়ার অলিম্পিক চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে।
সাংস্কৃতিক বিনিময় বরাবরই পারস্পরিক। চীনের সংস্কৃতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচারের পাশাপাশি গত কয়েক হাজার বছরে চীনে বিদেশের সংস্কৃতির প্রভাবও বিরাট। পেইচিং অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'সিল্ক রোড' নামক অধ্যায়ে প্রাচীনকালে চীনের বৈদেশিক সাংস্কৃতিক বিনিময়ের দুটি পথ সিল্ক রোড ও চেন হোর নৌযাত্রার দৃশ্য চিত্রিত করা হয়েছে।
পেইচিং অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পর চীনের বিখ্যাত গায়ক লিউ হুয়ান ও বৃটেনের নামকরা গায়িকা সারা ব্ল্যামান পেইচিং অলিম্পিক গেমসের থীম গান 'তুমি ও আমি' করেন। এ গানে পেইচিং অলিম্পিক গেমসের শ্লোগান 'এক বিশ্ব এক স্বপ্নের মমতা' প্রতিফলিত হয়েছে। দুজন নামকরা কণ্ঠশিল্পী এ গান গাওয়ার সময় পেইচিং অলিম্পিক গেমসের ২০০৮ জন স্বেচ্ছাসেবক বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশের ছেলেমেয়ের হাসিমুখ সম্বলিত ছাতা খুলে দেন। এর সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় স্টেডিয়াম - বার্ড নেস্টের আকাশে দর্শকরা ফটকায় ২০০৮ টি বাচ্চার হাসিমুখ দেখতে পান। শিশুদের হাসিমুখ দেখে সবাই মুগ্ধ হন। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের শিশুদের হাসিমুখ মানবজাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক। তাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ওই মুহূর্তে অভিন্ন আকাঙ্খা বিশ্ব জনগণের মন এক সাথে গেঁথে দিয়েছে।
অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করতে তিন বছর সময় লেগেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দশ হাজার মানুষ অংশ নিয়েছেন। চীনের সবচেয়ে বিখ্যাত পরিচালক ও সাংস্কৃতিক উপদেষ্টারা এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ডিজাইন ও প্রস্তুতিতে অংশ নিয়েছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের চমকপ্রদ পরিবেশনা উপস্থিত সকলের মনে এবং বিশ্ব অলিম্পিক আন্দোলনের ইতিহাসে চিরকাল থাকবে।
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়রা স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন। পেইচিং অলিম্পিক সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম্যান লিউ ছি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থেকে আসা খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের আন্তরিক স্বাগত জানিয়েছেন।
অলিম্পিক গেমসগুলোতে দেশের নামের অনুসারে খেলোয়াড়রা স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন। এবার পেইচিং অলিম্পিক গেমসে ২০৫টি দেশ ও অঞ্চলের প্রতিনিধি দল নতুন নিয়মে দশ অঞ্চলের চীনা অক্ষরের টানের সংখ্যা অনুসারে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে। চীনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এই পদ্ধতি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অনুমোদন পেয়েছে।
অলিম্পিক গেমসগুলোতে অলিম্পিক আন্দোলনের জন্মস্থান - গ্রীসের প্রতিনিধি দল সব ময় প্রথম প্রবেশ করে। বর্তমানে অলিম্পিক গেমসে গ্রীসের ক্রীড়াবিদদের পোশাকের রং সাদা ও হালকা ধুসর। একজন পোশাক ডিজাইনার বলেছেন, পেইচিং অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রথম প্রবেশকারী গ্রীস দল উপস্থিত সকলকে এক শান্তি সম্প্রীতি ও ঐক্যের তথ্য দিয়েছে।
সব শেষে স্বাগতিক দেশ - চীনের প্রতিনিধি দল স্টেডিয়ামে প্রবেশ করলে দর্শকদের আন্তরিক সম্বর্ধনা পেয়েছে। শত বছরের প্রতীক্ষার পর অলিম্পিক গেমস মহা প্রাচীরের দেশ চীনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। চীনাদের একশ বছরের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। চীনের প্রথম অলিম্পিক স্বর্ণপদকের বিজয়ী বিখ্যাত শুটিং খেলোয়াড় সুই হাই ফোঙ তার ভাষণে বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের প্রতি চীনা খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
অলিম্পিক গেমস এমন এক ধরনের প্ল্যাটফর্ম যার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের স্বপ্ন বাস্তবায়িত এবং অলিম্পিক চেতনা আরো সম্প্রসারিত করা হয়। আধুনিক অলিম্পিকের জনক পিয়েরে দ্য কুবাতিন বলেন, অলিম্পিক চেতনা অনুযায়ী জয়ী হওয়ার চেয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণই বড়।
উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার খেলোয়াড়রা হাতে হাত মিলিয়ে যে খেলার মাঠে প্রবেশ করেন, দর্শকরা তাতে প্রাণখোলা করতালিতে মুখর হয়ে ওঠেন। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন বলেন, অলিম্পিক গেমস এমন একটি মঞ্চে পরিণত হওয়া উচিত যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সমঝোতা বাস্তবায়িত করা যায়। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পর্বে আফগানিস্তান ও ইরাকও যার যার ক্রীড়া প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে। ইরাক বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে উঠে পেইচিং অলিম্পিক গেমসে অংশ নেয়ার অধিকার ফিরে পেয়েছে। এবার ইরাক ৭ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে। ইরাকের জাতীয় অলিম্পিক কমিটির চেয়ারম্যান মোস্তফা বলেন, অলিম্পিক গেমসে অংশ নিতে পেরে তারা খুব গর্বিত। ইরাক আন্তর্জাতিক পরিবারের একটি অংশ হিসেবে অলিম্পিক গেমসে অংশ নেবে। এবারের গেমসে ইরাকী খেলোয়াড়রা সফল হবেন এবং সেরা নৈপুণ্য দেখাবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।
আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির চেয়ারম্যান জ্যাক রগে বলেন, ক্রীড়া অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষে মানুষে যোগাযোগের সেতু গড়ে তোলা যায় যার মাধ্যমে যাতে মানবজাতি শান্তি ও সম্প্রীতি অর্জন করতে পারে। বর্ণ, সংস্কৃতি, ভাষা, রাজনীতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস হোক যাই না কেন, মানবজাতির জন্য আন্তর্জাতিক অলিম্পিক গেমসের ২০৫টি সদস্যের সম্প্রীতি, সহাবস্থান ও সংহতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
খেলোয়াড়রা ছাড়া বিভিন্ন দেশের ৮০ জনেরও বেশি রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানও এ অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। এ অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অলিম্পিক ইতিহাসের রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলেছে।
আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ৮৮ বছর বয়স্ক সম্মানসূচক চেয়ারম্যান সামারাঞ্চও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। চীনের জনগণের মনে সামারাঞ্চের নাম পেইচিং অলিম্পিক গেমসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। তিনি চীনের জনগণের পুরনো বন্ধু। ২০০১ সালে মস্কোতে তিনি পেইচিং অলিম্পিক গেমস ২০০৮-এর স্বাগতিক দেশ হিসেবে চীনের নাম বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেন, অলিম্পিক গেমস ২০০৮-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে তিনি খুব খুশি। চীনের জনগণ একটি অলিম্পিক

গেমস আয়োজনের জন্য আকুল প্রত্যাশা প্রকাশ করেছে এবং এর জন্য যে বিরাট চেষ্টা চালিয়েছে, সেটা তিনি ভালোভাবে উপলব্ধি করেছেন। এ অলিম্পিক গেমস চিত্তাকর্ষক ও সফল হবে এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অলিম্পিক গেমসে পরিণত হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি পেইচিংয়ে যা উপলব্ধি করেছেন, তা ৭ বছর আগের প্রত্যাশার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পেইচিং অলিম্পিক গেমসে সাংবাদিকতা করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ৩০ হাজারেরও বেশি সংবাদদাতা পেইচিংয়ে এসেছেন। এসব পেইচিং অলিম্পিক গেমসে সংবাদদাতাদের জন্য ইন্টারনেটের সেবা যোগানো হচ্ছে। এটা অলিম্পিকের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ইন্টানেটের মাধ্যমে অলিম্পিক গেমসের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যোগাযোগের সেতু তৈরি করা হচ্ছে। বেতার ও টেলিভিশন সংবাদদাতাদের সাক্ষাৎকারের সুবিধার জন্য ৮টি গুরুত্বপূর্ণ স্টেডিয়াম ও ইনডোর স্টেডিয়ামে বিশেষ পরিসেবা দেওয়া হচ্ছে এবং খেলোয়াড় ও সংবাদদাতাদের সুযোগ সুবিধার জন্য বিনা পয়সায় সাইবার ক্যাফেসহ বিভিন্ন ধরনের পরিসেবা সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রধান তথ্য কেন্দ্র যেমন সংবাদদাতাদের কাজের স্থান, তেমনি তাও তাদের দ্বিতীয় বাড়িও। তারা রাত দিন এখানে কাজ করছেন, শ্রোতা ও দর্শকদের জন্য অলিম্পিক গেমস সংক্রান্ত বৈচিত্র্যময় খবরাখবর দিচ্ছেন।

সকল খেলোয়াড়ের পক্ষ থেকে খেলোয়াড় প্রতিনিধি ঘোষণা করেছেন যে, অলিম্পিক চেতনা ও খেলোয়াড়দের মর্যাদা সম্প্রসারিত করার জন্য তারা পবিত্র ক্রীড়া মনোবল নিয়ে এ অলিম্পিক গেমসে অংশ নেবেন এবং খেলার বিভিন্ন নিয়মকানুন মেনে চলবেন।

সকল রেফারী ও কর্মীর তরফ থেকে রেফারী প্রতিনিধি শপথ গ্রহণ করেছেন যে, এ অলিম্পিক গেমসে তারা অলিম্পিকের সকল নিয়মকানুন মেনে চলবেন এবং যুক্তিযুক্ত ও নিরপেক্ষভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করবেন।

অলিম্পিক গেমস কেবল ষোল দিনের ব্যাপার নয়, অলিম্পিক গেমস পরবর্তীকালে ভেন্যুগুলোর ব্যবহার বিভিন্ন পক্ষের মনোযোগের ব্যাপার। পেইচিং অলিম্পিক গেমসের ভেন্যুগুলো ডিজাইন করার সময়ে এসব ভেন্যু পরবর্তী ব্যবহার ও উন্নয়ন বিবেচিত হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় সাঁতার কেন্দ্র "ওয়াটার কিউবের" ডিজাইন পরিকল্পনা থেকে বোঁঝা যায়, অলিম্পিক গেমসের পর এটা জনসাধারণের জন্যে পেইচিংয়ের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সম্পূর্ণ বিনোদন কেন্দ্র হবে। সুনই অলিম্পিক ওয়াটার পার্ক অলিম্পিক গেমস পরবর্তীকালে পেইচিংয়ের পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় পর্যটন বিনোদন এলাকায় পরিণত হবে। সুদূর থেকে আসা বিভিন্ন দেশের বন্ধুদের জন্য পেইচিং অলিম্পিক গেমস একটি দুস্প্রাপ্য সুযোগ। তারা যেমন স্বয়ং চীনের গল্প শুনতে পারবেন তেমনি স্বচক্ষে চীনকে দেখতে পারবেন এবং স্বশরীরে চীনকে অনুভব করতে পারবেন। পেইচিং অলিম্পিক গেমসের মাধ্যমে বিশ্বের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ আরও নিবিড়। এছাড়া বিশ্বের প্রতি চীনের উপলব্ধি বাড়ানোর পাশাপাশি চীনের প্রতি বিশ্বের উপলব্ধিও বেড়েছে। এটা হল বিশ্ব জনগণের জন্য পেইচিং অলিম্পিক গেমসের বয়ে আনা আরেকটি বড় সাফল্য।

অলিম্পিক গেমসের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে চীনে আরও উন্মুক্ত লাভ করার প্রক্রিয়া। গত সাত বছরে চীন ডাব্লিও টিওতে যোগ দিয়েছে, বৈদেশিক প্রচার মাধ্যমের ব্যবস্থাপনা বিধান সংশোধন করেছে, সরকারের তথ্য আরও উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ। "এক বিশ্ব, এক স্বপ্ন" অলিম্পিক গেমসের স্লোগান। এতে পুরোপুরি অলিম্পিক চেতনার প্রতি চীনের উপলব্ধি ব্যক্ত করা হয়েছে।

মহামহিময় রাষ্ট্রীয় স্টেডিয়াম "বার্ড নেস্ট", সুন্দর রাষ্ট্রীয় সাঁতার কেন্দ্র "ওয়াটার কিউব" ও আধুনিক উ খো সন বাস্কিডবল ভবন সহ বিভিন্ন ভেন্যু সবই দেশি-বিদেশী বড় ডিজাইনারদের যৌথ উদ্যোগে তৈরি। পেইচিং অলিম্পিক গেমসের প্রতীক, মঙ্গল প্রাণী, ক্রীড়া চিহ্ন, মশাল সহ সকল ডিজাইনে বেশী কিছু দেশি-বিদেশী শিল্পীর প্রয়াস প্রতিফলিত হয়েছে।

৮ আগষ্ট রাত্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর, ৯ আগষ্ট অলিম্পিক গেমসের প্রথম দিনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদদের জন্য পেইচিং অলিম্পিক গেমসে সাফল্য পাওয়া তাদের স্বাভাবিক আকাংক্ষা। ❑

বিশ্ব আদিবাসী দিবস

॥ ফারুক হোসেন ॥

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্রথম ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ১৯৯৩ সাল বিশ্ব আদিবাসী বর্ষ হিসেবে পালিত হবে (সিদ্ধান্ত ৫৪/১৬৪)। ১৯৯৩ সালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (সিদ্ধান্ত ৪৮/১৬৩) যে, ১৯৯৪ এর ১০ ডিসেম্বর থেকে পালিত হবে বিশ্ব আদিবাসী দশক। সাধারণ পরিষদ ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ওই সভায় ঘোষিত বিশ্ব আদিবাসী দশকের আবরণে ১৯৯৫ এর জন্য কর্ম পরিকল্পনাও গ্রহণ করে (সিদ্ধান্ত ৫০/১৫৭)। বর্ষ এবং দশক ঘোষণার পর পুনরায় ১৯৯৪ এর ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে এ মর্মে সিদ্ধান্ত (সিদ্ধান্ত ৪৯/২১৪) গ্রহণ করা হয় যে, আদিবাসী দশকের প্রতিটি বছরেই ৯ আগস্ট পালিতহবে বিশ্ব আদিবাসী দিবস। মানবাধিকার কমিশনের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সাব কমিশনের আদিবাসী জনগণ সম্পর্কিত কর্মদল তাদের প্রথম সভায় ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে আদিবাসী দিবস পালনের জন্য ৯ আগস্টকে বেছে নেয়। আদিবাসী জনগণের মানবাধিকার, পরিবেশ, উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করা ও গণসচেতনতা সৃষ্টি করাই বিশ্ব আদিবাসী দশক, বর্ষ ও দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য।

বিশ্বে ৭০টি দেশে ৩০ কোটি আদিবাসী জন জাতি রয়েছে। তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ইন্ডিয়ান, অস্ট্রেলিয়ার ইনুইট বা এস্কিমোস, উত্তর ইউরোপের সামী, নিউজিল্যান্ডের মাওরি অন্যতম। বলিভিয়ার মোট জনসংখ্যার ৬০% আদিবাসী। পেরু ও গুয়াতেমালার মোট জনসংখ্যার অর্ধেক আদিবাসী। তাছাড়া চীন, ভারত, মায়ানমারেও বিরাট সংখ্যক আদিবাসী জাতি বাস করে। বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী আদিবাসী জনসংখ্যা ১২,০৫,৯৭৮ জন। বেসরকারী হালনাগাদ হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ৪৫টি আদিবাসী জাতিসত্তা মিলে আদিবাসী জনসংখ্যা আনুমানিক ১৬ লক্ষেরও বেশি। জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণ মতে কিছু কিছু ভিন্নতা ছাড়া সকল আদিবাসীর

মধ্যে অনেকক্ষেত্রে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। মিলগুলো হচ্ছে তারা গরীব, দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস, অনেকেই লিখতে ও পড়তে জানে না, সীমাহীন নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার - তারা নিজ দেশে বাস করে অনাহুত পরবাসীর মতো। অথচ এই আদিবাসী বিশ্ব মানব পরিবারের অংশীদার এবং নিজ নিজ দেশ গঠনে, দেশের উন্নয়নে, সামাজিক সাংস্কৃতিক বিকাশে তাদেরও অবদান রয়েছে। বাংলাদেশেও আদিবাসী জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধে ও দেশ গঠনে তাদের অগ্রণী ভূমিকা ও কার্যক্রম রেখেছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের প্রতি অন্যায়, অবিচার, নিপীড়ন, উৎপীড়ন ও বিভিন্নভাবে অত্যাচারে তাদের অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। এ অবস্থায় আদিবাসী জনগণের সংহতি ও তাদের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বিশ্ব আদিবাসী দিবসের লক্ষ্য। জাতিসংঘের মৌলিক নীতি হচ্ছে জাতি, বর্ণ বা ভাষা লিঙ্গ লঘুত্বের কারণে কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। তাই বিশ্বের আদিবাসীকে শ্রদ্ধা করা, তাদের অংশীদার করা তাদের মৌলিক অধিকার ও মুক্তির সংগ্রামে সংহতি প্রকাশ করার আহ্বান জানায় আজকের বিশ্ব মানবসমাজ।

যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অনেক দেশে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশে এখনও সরকারীভাবে দিবসটি পালিত হয়নি। যদিও বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র। এ দেশে কমপক্ষে ৪৫টি সংখ্যালঘু জাতিসত্তা বা আদিবাসী গোষ্ঠী দুটি পৃথক ভৌগলিক পরিবেশে বাস করে। এ দুটি ভৌগলিক পরিবেশের একটি পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙ্গামাটি, বান্দরবন এবং খাগড়াছড়ি) এবং আরেকটি উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহ। এর মধ্যে মধুপুরের গড়াঞ্চল বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। ৪৫ আদিবাসী হচ্ছে গারো, খিয়াং ম্রো, বন, চাকমা, চাক, পাংখু, লুসাই, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গা, রাখাইন, খাশিয়া, মনিপুরী, ঘুনী, হাজং, বানাই, কোচ, ডালু, সাঁওতাল, মুন্ডা পাহাড়িয়া, মাহাতো, সিং খারিয়া, খন্ড, আসাম (বহমিয়া), গোর্সা, কর্মকার, পাহান, রুজুয়াড়, মুসহর, রাই, বেদিয়া, কন্দি কোল, কাজবশী, পাত্র, মুরিয়ার তুরি মাহাসী, মালো, উঁরাও, ক্ষত্রিয় চমনি, রাজবংশী।

তাদের বহু দিনের দাবি হচ্ছে সাংবিধানিক স্বীকৃতি। বাংলাদেশে আদিবাসী বর্ষ, দশক, দিবসে আদিবাসীদের মূল দাবিই হচ্ছে সাংবিধানিক স্বীকৃতি। জীবনের পর তাদের অধিকার ভূমি ও অরণ্যের উপর অধিকার। সম্পদের উপর অধিকারও তাদের দাবি। এসব দাবিতে দিবসের চেতনায় আদিবাসীগণ সংহত হচ্ছে। ১৯৯৯-এ বাংলাদেশে বিশ্ব আদিবাসী উদ্‌যাপন কমিটি দিবসটি যথাযথভাবে পালন করে। ওই বছর দিবসের মূল লক্ষ্য ছিলো - সংহতি প্রত্যাশায় বাংলাদেশের আদিবাসী। ২০০০ সালেও একই প্লাটফর্ম থেকে দিবস উদ্‌যাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উদ্‌যাপনের এই ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত আছে। ❑

আন্তর্জাতিক যুব দিবস

॥ ফারুক হোসেন ॥

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখের সভায় ১২ আগস্টকে আন্তর্জাতিক যুব দিবস ঘোষণা করে (সিদ্ধান্ত ৫৪/১২০ আই)। ৮ থেকে ১২ আগস্ট ৯৮ তারিখে (সিবনে অনুষ্ঠিত যুব মন্ত্রীদের বিশ্ব সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ২০০০ সাল ও পরবর্তীতে যুবকদের জন্য আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য বিনিময়ই হচ্ছে দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে ১৯৯৫ এর ১৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০০০ সাল ও পরবর্তীকালের জন্য বিশ্ব যুব কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে। (সিদ্ধান্ত ৫০/৮১)।

সাধারণ পরিষদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে যে, রাষ্ট্রসমূহের যুব সমাজ উন্নয়নের জন্য বৃহৎ মানব সম্পদ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের চাবিকাঠি। এই প্রেক্ষাপটে যে পথে যুবসমাজের দক্ষতা ও চ্যালেঞ্জ পরিচালনা করা হবে তারই প্রভাব পড়বে বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। প্রভাব পড়বে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন যাপন ও কল্যাণের ওপর। সামাজিক জীবনে যুবক ও যুব মহিলাদের সকল কর্মে অংশ গ্রহণ, বিগত দশকে উন্নয়ন, অংশগ্রহণ, এবং শান্তির ক্ষেত্রে মৌলিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, যুব সমাজের অবস্থার পরিবর্তনের বিষয়ে বেসরকারি সংস্থার সাথে ক্রমাগত সংলাপ ও পরামর্শগ্রহণের বিষয়টি মাথায় রেখে এবং ১৯৯০ ও ১৯৯৪ এ অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ২০০০ সাল ও পরবর্তীকালের জন্য বিশ্ব যুব কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনায় দশটি ক্ষেত্র অর্থাৎ শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ক্ষুধা ও দারিদ্র, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, মাদকের অপব্যবহার, কিশোর অপরাধ, অবসরের কর্মকাণ্ড, কিশোরী ও যুব মহিলা এবং সমাজ জীবনে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুবকদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশ গ্রহণ বিষয়ক অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বিশ শতকের শেষ দশেকে বিশ্বে পরিলক্ষিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক মৌলিক পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে একুশ শতকের ওপর। অপর দিকে সমাজের শক্তি উপকারভোগী এবং সামাজিক পরিবর্তনের শিকার সিংহভাগই যুবসমাজ। তারা প্রতিনিয়ত ভাগ্য দ্বারাও পরিচালিত। রাষ্ট্রসমূহের যুবসমাজ অবস্থান করেছে উন্নয়ন ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থানের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে। তাদের পরিকল্পিতভাবে সুগঠিত করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই কর্ম পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক যুব দিবস উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনার বিষয় সচেতনতা সৃষ্টি, যুব সমাজের জন্য কর্মের সুযোগ সৃষ্টি, সামাজিক কাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় যুব সমাজের শান্তি রক্ষা প্রয়াসেই একটি উদ্যোগ হচ্ছে কর্মপরিকল্পনা।

অপার সম্ভাবনাময় দেশে দেশে বিদ্যমান যুব শক্তিকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার প্রয়াসে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য এর আগেই জাতিসংঘ ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক যুববর্ষ ঘোষণা করে। এই ঘোষণার আলোকে বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের মতো আন্তর্জাতিক যুববর্ষ পালন করে এবং একই চেতনায় প্রতিবছর ১ নভেম্বর পালন করে যুবদিবস। পরবর্তীতে যুবদিবসের মধ্যে কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ না রেখে জাতীয় যুব উৎসব পালন করে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। প্রতি বছর ১ ডিসেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত পালিত হয় এই যুব উৎসব।

দেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশই হচ্ছে যুবক। আবার এদের মধ্যে ৮৬ শতাংশই বেকার। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সুগঠিত যুব সমাজই গড়তে পারে একটি সমৃদ্ধ দেশ, তাই যুব শক্তিকে কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব সম্পদে পরিণত করাই হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গ্রহণ করে নানাবিধ কর্মসূচি। যুবকদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ, মানবীয় গুণাবলী অর্জন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ দূষণরোধ, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ প্রক্রিয়া যুবকদের অংশগ্রহণ, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ পূর্বক আত্মকর্ম সংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতায়ন প্রভৃতি অর্জনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। যুব ও যুব মহিলাদের সুগঠিত ও সুশৃংখল করে দক্ষ ও উৎপাদনমুখী যুবশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন জাগৃতি। এই জাগৃতির জন্য বাংলাদেশ যে যুব উৎসব পালন করে তাতে থাকে যুব পুরস্কার, রচনা প্রতিযোগিতা, যুবর্যালী, যুব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার যুব মেলা ইত্যাদি।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২০০০-এ এই প্রথম পালিত হয় আন্তর্জাতিক যুব দিবস। এ বছর সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালনের কোনো কার্যক্রম ছিলো না। যুব উৎসব পালনের পাশাপাশি ভবিষ্যতে বাংলাদেশ জাতিসংঘের নির্দেশনার আলোকে পূর্ণমর্যাদায় ও কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালন করবে। ❑